ছোটোদের

জনতার জিয়া

আমিরুল ইসলাম কাগজী

মনন প্রকাশ

লেখকের কথা

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষণজন্মা এক নেতা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জয় করে নিয়েছিলেন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়। তিনি যে বিপদের কাণ্ডারী তার প্রমাণ রেখেছিলেন দফায় দফায়। তিনি ছিলেন এক আদর্শবান পুরুষ। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও অন্যায় তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর অতি বড়ো দুশমনও তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করতে পারেনি। তাই শহিদ জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবন আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস। ছোটোমণিরা তাঁর জীবনী পড়লে আদর্শ পথ অনুসরণ করতে পারবে। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় খুঁজে পাবে। পুরো বইটি তাদের উপযোগী করে লেখা। আশাকরি ছোটোমণিরা উপকৃত হবে বইটি পড়ে।

বইটি লিখতে গিয়ে এর তথ্য সংগ্রহ করার সময় আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বগুড়ার সাংবাদিক শেখ মাহবুব হোসেন, লেমন, মোহন আখন্দ, আনন্দ, আতিকুর রহমান রুমন, আবুল কালাম আজাদ। আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন মনন প্রকাশ-এ স্বত্বাধিকারী শাহ আল মামুন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন স্নেহভাজন অধ্যাপক মিলন রায়। আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

সৈনিক জিয়া

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সৈনিক জীবন ছিল বীরত্ব আর সাফল্যে গাথা। একজন সৈনিকের যেমন টার্গেট থাকে শীর্ষ পদে যাওয়ার, জিয়াউর রহমানের ভেতরও ছিল সেই একাগ্রতা এবং আন্তরিকতা।

ছোটোমণিরা আমরা তাঁর সেই গৌরবময় সৈনিক জীবন নিয়ে আলোচনা করার আগে তাঁর ছেলেবেলা এবং ছাত্রজীবন নিয়ে আলোচনা করব।

শহিদ জিয়ার জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। বগুড়া জেলার বাগবাড়ি গ্রাম। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের মতো এটাও একটা নিভৃত গ্রাম। এখানেও পাখির ডাকে ভোর হয়। সকালে কৃষাণ কৃষাণীরা খেতে কাজ করতে যায়। গ্রামটি গাবতলী থানায় অবস্থিত। ব্রিটিশ আমল থেকেই এ গ্রামে নিয়মিত শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা হতো, এই গ্রামেই একদিন আজানের ধ্বনিতে ঘোষিত হয় এক নবজাতকের আগমনী বার্তা। নাম তাঁর জিয়াউর রহমান কমল। ছোটোবেলায় তিনি কমল নামেই সবার কোমল হৃদয় জয় করে ফেলেন। তাঁর পিতার নাম মনসুর রহমান, মায়ের নাম জাহানারা খাতুন রাণী। দাদা ছিলেন বাগবাড়ি গ্রামের মননশীল চিন্তার অধিকারী ধর্মপ্রাণ পুরুষ মৌলভি কামাল উদ্দিন। দাদি মিসিরন ছিলেন

গুণবতী-আদর্শবর্তী রমণী। নানার নাম আবুল কাশেম। নানি রহিমা খাতুন। বাগবাড়ির যে বাড়িতে জিয়াউর রহমানরা এসে থাকতেন সেটাই ছিল তাঁর নানার বাড়ি। তাঁর ছিল চায়ের ব্যবসা এবং প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক ছিলেন তিনি। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে জিয়া ছিলেন দ্বিতীয়। কোনো বোন ছিল না তাঁর। জিয়াউর রহমানের পিতা মনসুর রহমান পেশায় একজন কেমিস্ট। চাকরি করতেন কলকাতায় এবং ওখানেই তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর তিনি চলে যান করাচি এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। জিয়াউর রহমানের মাতা জাহানারা খাতুন ছিলেন একজন সংগীত শিল্পী। তিনি ভালো নজরুল গীতি গাইতেন। সে সময় করাচি রেডিওর তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত শিল্পী। এছাড়া তাঁর অন্যতম গুণ ছিল তিনি সহজেই মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারতেন। জিয়াউর রহমানের পিতা ইন্তেকাল করেন ১৯৭০ সালে ।

জিয়াউর রহমান কমলের শিক্ষা জীবন শুরু হয় কলকাতার 'হেয়ার স্কুলে'। এটি একটি খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল। কিন্তু বেশিদিন তিনি সেখানে থাকতে পারেননি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ এসে লাগে ভারত বর্ষে। জাপান কলকাতার খিদিরপুর ডকে বোমা বর্ষণ করলে সেখানকার বাসিন্দারা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে গ্রামে। জিয়ার পিতা মনসুর রহমানও চলে আসেন গ্রামের বাড়ি বাগবাড়িতে। জিয়া ভর্তি হন সেই গ্রামের স্কুলে ১৯৪৩ সালে। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষও বিভক্ত হয়ে যায়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে মনসুর রহমান চলে যান করাচিতে। পিতার চাকরি সূত্রে তিনি ভর্তি হন করাচি অ্যাকাডেমি স্কুলে এবং ১৯৫২ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে মেট্রিক পাশ করেন। একই বছর তিনি ভর্তি হন করাচির ডি.জে. কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে।

জিয়াউর রহমানের জীবনী থেকে দেখা যায় তাঁর বড়ো ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হয়ে গ্রামের গরিব মানুষের সেবা করার। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূরণ হয়নি। কলেজে লেখাপড়া করতে করতেই তিনি পরীক্ষা দেন সেনাবাহিনীর অফিসার পদে। ১৯৫৩ সালে তিনি সামরিক একাডেমিতে ভর্তি হন অফিসার ক্যাডেট হিসাবে।

জিয়াউর রহমান যখন অফিসার ক্যাডেট হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একটা খারাপ ধারণা ছিল। তারা মনে করত বাঙালিরা সেনা অফিসার হওয়ার যোগ্য নয়। তাই তো সেনাবাহিনীতে বাঙালি অফিসার খুবই কম ছিল। তবে অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সব ধারণা ওলটপালট করে দেন জিয়াউর রহমান। কঠোর নিষ্ঠা, নিয়ম শৃঙ্খলা আর অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমেই তিনি একের পর এক এগিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৫৫ সালে তিনি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন লাভ করেন। কমান্ডো ট্রেনিং গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তিনি দক্ষতার সঙ্গে শত্রু মোকাবেলার কৃতিত্ব অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তাঁর সাফল্য ছিল অনেক। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন পেশাদার সৈনিক। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখায় তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই শাখায় কাজ করতে গিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানিদের শোষণ করছে। ঘুরে যায় তাঁর জীবনের মোড়। হৃদয়ে জাগ্রত হয় স্বাজাত্যবোধ।

জিয়া বুঝতে পারলেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনোদিন পূর্ব পাকিস্তানকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না। তাই তো সবখানেই বৈষম্য। চাকরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। আর নিম্নপদে চাকরি দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে। সেখানে মেধা যাচাই করা হতো না। পূর্ব পাকিস্তানিদের সম্পর্কে খারাপ প্রচারণা চালানো হতো সেখানে। বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন

কাজ করে না, তারা আন্দোলনমুখী। তারা সামরিক বাহিনীতে কাজ করার অযোগ্য। কারণ তারা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত না। তাদের সাহস নেই, বুদ্ধি নেই, মেধা নেই। এমনি সব উদ্ভট প্রচারণার এক পর্যায়ে আসে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেল পাকিস্তানের। ডাক পড়ল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'আলফা কোম্পানি'র। জিয়া ছিলেন এই কোম্পানির ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার। তাঁর কমান্ডে আলফা কোম্পানিকে পাঠানো হলো খেমকারান সেক্টরের বেদিয়ান রণাঙ্গনে। প্রতিপক্ষ ছিল ভারতের সপ্তদশ রাজপুত, ঊনবিংশ মারাঠী লাইট ইনফেন্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরির সাঁজোয়া বহর। জিয়াউর রহমান অসীম সাহস এবং প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে ঘায়েল করেন শত্রুপক্ষ। তিনি এককভাবে তাঁর আলফা কোম্পানির সাহায্যে ভারতের বাহিনীকে পিছু হটাতে বাধ্য করান। খেমকারান সেক্টরে জিয়ার কৃতিত্ব বাঙালিদের সম্পর্কে সব ধারণা পাল্টে দেয় পাকিস্তানিদের। কারণ ওই যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য প্রাণভয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করে। এজন্য যুদ্ধের পরে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যের কোর্ট মার্শালে শাস্তি হয়। একমাত্র বাঙালি সৈন্যরা কারো কাছে মাথা নত করেনি। আত্মসমর্পণ করেনি। আর পালিয়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না। জিয়াউর রহমানের এই কৃতিত্বের কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অফিসার জোয়ানদের কদর বেশ বেড়ে যায়। বাঙালি যুদ্ধ করতে পারে না– এইকথা বলার সাহস আর পাকিস্তানিদের থাকল না। শুধু স্থলযুদ্ধে নয়– আকাশ যুদ্ধেও বাঙালি অফিসাররা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাঙালিদের মেধা মনন সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা আর সাহস দেখে ঘাবড়ে যায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তারা বুঝতে পারল পাকিস্তানিরা মোটাতাজা হলে কী হবে তাদের বুদ্ধি এবং সাহস কম। সেক্ষেত্রে বাঙালি অফিসারগণ অনেক এগিয়ে। তাদের আর দমিয়ে রাখা যাবে না। যুদ্ধে যেহেতু পারদর্শী সেহেতু তারা একদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। তাইতো তারা দক্ষ বিচক্ষণ বাঙালি সামরিক অফিসারদের অবসর দিতে লাগল। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানেও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকল।

যাহোক খেমকারান সেক্টরে যুদ্ধের কৃতিত্ব প্রদর্শন করার জন্য ১৯৬৬ সালে কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে জিয়াউর রহমানকে পিএসসি উপাধি দেওয়া হয়। ঐ বছরই তাঁকে পাকিস্তানের কাকুলস্থ সামরিক অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষক বা ইস্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সামরিক অ্যাকাডেমিতে নতুন জীবন শুরু করলেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীতেও তখন বিভেদ বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছে। খাওয়া, দাওয়া, প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সবখানেই বৈষম্য। বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করা যায় না। সব মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। অন্তরে ক্ষোভ নিয়ে কাজ করছেন জিয়া। ১৯৬৮ সালের দিকে তাঁকে বদলি করা হলো পূর্ব পাকিস্তানের জয়দেবপুরে। এখানে সাব-ক্যান্টনমেন্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জিয়াকে। তাঁর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম। প্রচণ্ড বাঙালি বিদ্বেষী। বাঙালি অফিসারদের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। সেনা অফিসারদের সঙ্গে তিনি যেমন আচরণ করতেন তেমনি বাঙালিদের প্রতি খারাপ আচরণ করতেন। ঢাকার রাজপথে তখন যেসব আন্দোলন চলছিল সে ব্যাপারে ছিল তার কঠোর মনোভাব। এদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য যা কিছু করা দরকার তিনি সেই সুপারিশ করে পাঠাতেন পশ্চিম পাকিস্তানে। জিয়াসহ দায়িত্বশীল বাঙালি অফিসারগণ বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। আর লে. কর্নেল কাইয়ুমকে কীভাবে দমন করা যায় তা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতেন। কিন্তু একদিন দেখা গেল সেই কাইয়ুমই ছাত্র জনতাকে দমন করার জন্য মাঠে নেমে পড়েছেন। ১৯৬৯ সাল। জয়দেবপুরে পাক শাসক বিরোধী ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। তার এই দমন-নীতির খবর জানাজানি হয়ে পড়ে। বিক্ষোভ জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় স্থানান্তর হয়। আর সেই বিক্ষোভ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

জিয়াউর রহমান '৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে যান পশ্চিম জার্মানিতে। সেখান থেকে চার মাসের ট্রেনিং নিয়ে তিনি জয়দেবপুরেই যোগদান করেন স্বীয় পদে। তখন সারাদেশের অবস্থা অশান্ত। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে চট্টগ্রামে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের ষোলোশহর বাজারে নবগঠিত অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান। মেজর জিয়া সেখানে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়। '৭১-এর মার্চের শুরু থেকেই জিয়ার গতিবিধি তারা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। কিন্তু কোনো কিছুই জিয়াকে তাঁর কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিংবা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। জিয়া বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোনোদিনই '৭০-এর নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেবে না। অতএব বাঙালিদের উপর অত্যাচার নেমে আসবে। কারণ বাঙালিরা নির্বাচনী ফলাফল প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে আর তারা দেবে বাধা। যুদ্ধ অনিবার্য। তাই তিনিও পাল্টা প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিশেষ করে ৭ই মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবের ভাষণের পর পাকিস্তানি এবং বাঙালি অফিসারদের মাঝে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তখন মেজর জিয়া বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করতে থাকেন। তারাও প্রস্তুত।

মার্চের মাঝামাঝি পাকিস্তান থেকে অস্ত্র বোঝাই দুটি জাহাজ 'বাবর' ও 'সোয়াত' এসে ভিড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে। বন্দর শ্রমিকরা ঘোষণা দিল তারা অস্ত্রখালাস করবে না। কারণ তারা জানে এসব অস্ত্র ব্যবহার করা হবে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। তাই তারা জাহাজ দুটোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। পাকিস্তানিরা যাতে অস্ত্র খালাস করতে না পারে সেজন্য তারা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেডও দিল। গোটা চট্টগ্রামের অবস্থা তখন উত্তপ্ত।

এমনি সময়ে এলো সেই ভয়াল রাত ২৫ মার্চ। রাত ১১টার সময় অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়া ডেকে পাঠালেন মেজর জিয়াকে। হুকুম দিলেন চিফ পোর্ট অফিসার জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। এ ধরনের হুকুমের পেছনে দুরভিসন্ধি থাকে জেনেও জিয়া অত্যন্ত সচেতনভাবে নৌবাহিনীর একটি ট্রাক নিয়ে ছুটে চললেন বন্দরের দিকে। কিন্তু রাস্তায় নামতেই একের পর এক ব্যারিকেড। কিছু ব্যারিকেড সরিয়ে তিনি যখন আগ্রাবাদের কাছে যান তখনই সেখানে ছুটে আসেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী। উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় তাঁর কথা ভালো বুঝা যাচ্ছিল না। তারপরও তিনি ঢাকা শহরে রাতে পিলখানায় ঘটে যাওয়া পাক বাহিনীর হামলা সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। বললেন, ইপিআর সদর দফতর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা হয়েছে। সারা শহরে আগুন জ্বলছে, পাক সেনারা চট্টগ্রামেও হত্যাকাণ্ড শুরু করে দিয়েছে। এখন আমরা কী করব?

অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মেজর জিয়া বললেন, "আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করব।"

এরপর তিনি কীভাবে তাঁর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করলেন এবং কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন তার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে, আমরা এখানে কেবল জিয়ার সৈনিক জীবনের অংশটুকুই বর্ণনা করব।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শহিদ জিয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর বিরল কৃতিত্ব ও সাহসিকতার জন্য বীরোত্তম খেতাব পান। তিনি সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। এবং পদোন্নতি পেয়ে লে. কর্নেল হন। শুরু হয় আওয়ামী লীগ শাসন। ক্ষমতায় বসেই শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর সমান্তরাল আরেকটি বাহিনী গড়ে তোলেন। এর নাম রক্ষীবাহিনী। রক্ষীবাহিনীর খাওয়া দাওয়া পোশাক সবই উন্নতমানের। কিন্তু যারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধ করল সেই সিপাহিদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হলো না।

বরং তাদের জীবনযাত্রার মান আরো কমে গেল। ঠিকমতো খাদ্য দেওয়া হতো না। পোশাক দেওয়া হতো না। ফলে তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ দেখা দিল। কিন্তু জিয়াউর রহমানেরও কিছু করার ছিল না। তবে তাদের দুঃখ বেদনা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন। তাদের দুঃখের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এ কারণে তিনি সিপাহিদের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। সিপাহিরা যে প্রাণ দিয়ে জিয়াউর রহমানকে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ মিলেছে ওই দিন। জিয়াউর রহমান ডেপুটি চিফ অব স্টাফ থেকে সেনাবাহিনী প্রধান হন ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট।

স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া

'আমি মেজর জিয়া বলছি'। ইথারে ইথারে ভেসে এলো মুক্তি পাগল মানুষের কানে। সেই দিন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। গোটা জাতি তখন নেতৃত্ব শূন্য। কী করতে হবে কেউ কিছু বলতে পারছে না। কোথায় যেতে হবে তাও জানা যাচ্ছে না। আগের রাতে রাজধানী ঢাকার পিলখানায় সাবেক ইপিআর ক্যাম্পে গুলি চালিয়েছে পাক হানাদার বাহিনী। তারা গুলি চালিয়েছে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। রাতের আঁধারে ঘুমন্ত মানুষের উপর চলেছে হামলা। ভোরবেলায় যে যা পারছে তাই নিয়ে ঢাকা শহর ত্যাগ করছে।

শুধু ঢাকা শহর নয় অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও পাক হানাদার বাহিনী হামলা করেছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসেছে। বিমানে উড়ে আসছে আধুনিক অস্ত্রে সাজানো পাক বাহিনী। রাস্তায় রাস্তায় চলছে টহল। ঠিক এমনই এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বালিয়ে দিলেন মেজর জিয়া। বললেন,

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রিয় সহযোদ্ধা ভায়েরা, আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রভিশন্যাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণার পর গোটা জাতি ঘুরে দাঁড়াল। সবাই যেন বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পারল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি নিয়ে অনেকেই বিতর্ক করে থাকেন। কিন্তু মূল কথা হলো ঘোষণা। আর সেই স্বাধীনতার ঘোষণা সেদিন জনগণ শুনেছিল মেজর জিয়ার কণ্ঠে। আর দিনটি হলো ২৬ মার্চ। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় প্রথম শোনা যায় ওই ঘোষণা। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র তখনো ভালো করে চালু হয়নি। তাই প্রথম দিনের ঘোষণা চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের আশেপাশের লোকজন শুনেছিল । শ্রোতাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত লোকের কথা এখানে বলা যায়। তিনি হলেন জ্ঞানতাপস মরহুম সৈয়দ আলী আহসান। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লিখে গেছেন স্বাধীনতার ঘোষণার কথা। ২৬ মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি স্ত্রী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে জন্মদিন পালন করছিলেন। রেডিও খোলা ছিল। একসময় সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শিহরণ জাগানো কণ্ঠস্বর। আমি মেজর জিয়া বলছি, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। পরের দিন ২৭ মার্চ আবার সেই ঘোষণা– তবে পরের দিনে সেই ঘোষণায় কিছু পরিবর্তন ছিল। প্রথম দিনের ঘোষণায় মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট হিসাবে উপস্থাপন করেন। পরের দিন ঘোষণা দেন শেখ মুজিবর রহমানের নামে। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জিয়া বলছি, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বের সকল স্বাধীনতা প্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায়সংগত যুদ্ধের প্রতি সমর্থন দিন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

স্বাধীনতার এই ঘোষণা ২৭ মার্চ সকাল থেকে প্রতি ১৫ মিনিট পর পর কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ওই ঘোষণা শোনার পর মুক্তিপাগল মানুষ আবার সংগঠিত হতে থাকে। চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে যত সহজে এই স্বাধীনতার ঘোষণা আমরা বর্ণনা করলাম ঘটনাটি অত সহজ ছিল না। ২৫ মার্চ রাতে যে সময়ে ঢাকায় ঘুমন্ত মানুষের উপর পাক সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক একই সময়ে চট্টগ্রামেও হামলা হয়। তবে ঢাকার অবস্থার কথা চট্টগ্রামের মানুষ জানে না। কারণ টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। চট্টগ্রামে যে প্রতিরোধ এবং বিক্ষোভ হচ্ছে তা কেবলই তাদের নিজস্ব উদ্যোগে। চট্টগ্রাম সেনানিবাসেও এর প্রভাব পড়ছে। সেখানে ভেতরে ভেতরে দুটো গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে। একদিকে পাকিস্তানি সেনা অন্যদিকে বাঙালি সেনা। পাকিস্তানিরা আগেই নির্দেশ পেয়ে গেছে তাদের কী করতে হবে। তারা নিজেদের সংগঠিত করে ফেলেছে। ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামেও তারা প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেখানকার কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া তার প্রথম টার্গেট করেন তৎকালীন বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল মেজর জিয়াকে। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। সেখানেই ঘটনার নাটকীয় মোড় নেয়। জিয়া বুঝে ফেলেন তাঁর ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি এগুচ্ছেন। বন্দরে যাওয়ার পথেই ছোটো ছোটো অনেক ব্যারিকেড পড়ে। সবগুলো সরালেন। কিন্তু আগ্রাবাদে পড়ে একটা বড়ো ব্যারিকেড। সেটা সরানোর জন্য সিপাহিদের নিয়ে নেমে পড়লেন জিয়া। ব্যারিকেড সরানোর সময় তিনি পায়চারি করতে থাকেন রাস্তার একপাশে। প্রতি পদক্ষেপে তিনি স্থির করতে থাকেন তাঁর পরিকল্পনা। ঠিক এমন সময় সেখানে উপস্থিত হন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী। গোপনে তিনি জিয়ার কাছে বললেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিকল্পনার কথা। তিনি মেজর জিয়ার কানে কানে বললেন, ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী হামলা শুরু করেছে। পাকিস্তানিরা চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং শহরে একত্রে হানা দিতে প্রস্তুত। এখন আমাদের কী করা উচিত? কথাটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে মেজর জিয়া বললেন, "আমরা বিদ্রোহ করলাম।" তিনি খালেকুজ্জামানকে নির্দেশ দিলেন ষোলোশহর যেতে এবং পাক সেনা অফিসারদের গ্রেফতার করতে। বললেন ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে (কর্নেল অলি) ব্যাটেলিয়ন প্রস্তুত রাখতে।

এরপর জিয়া চলে গেলেন ট্রাকের কাছে। সেখানে বসা পাকিস্তানি নৌ বাহিনীর চিফ পোর্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে বললেন বন্দরে যাওয়া হচ্ছে না। হুকুম বদলে গেছে। জিয়া ট্রাকে উঠেই তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন। বললেন, "তোমরা এখন আমার কাছে বন্দি। অস্ত্র ফেলে দাও নইলে গুলি

করব।" তারা ভয়ে ভয়ে অস্ত্র ফেলে দিল। পরে তিনি চট্টগ্রাম সেনাবিনাসে পৌঁছে কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়ার জিপ নিয়ে তারই বাসায় চলে গেলেন। কলিংবেল টিপতেই পায়জামা পাঞ্জাবি পরা কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া বেরিয়ে এলেন। দরজা খুলেই তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যাঁকে বন্দি করার জন্য ফাঁদ পাতলেন তাঁকেই তিনি দেখছেন চোখের সামনে। কীভাবে সম্ভব হলো! কোনো কথার সুযোগ না দিয়েই তার মাথায় স্টেনগান ঠেকিয়ে জিয়া বললেন, 'আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে? এখন আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। আমরা বাঙালি অফিসারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি।'

এভাবে সারা রাতের অভিযানে মেজর জিয়া চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কমান্ড নিজ হাতে নিয়ে নেন। পরের দিন ২৬ মার্চ তিনি বাহিনী নিয়ে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গমন করেন। বেতার কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার কর্মকর্তা কর্মচারীরা মেজর জিয়াকে দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। জিয়া তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে এক চেয়ারে বসে পড়েন। সেখানেই তিনি কাগজ নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাটি লেখার চেষ্টা করেন । বার বার কাগজ নিচ্ছেন এবং লিখছেন। কিন্তু যুতসই হচ্ছে না। দীর্ঘ সময় পরে তিনি ইংরেজিতে লেখেন সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি। লিখেই নিজে সেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে। এই ঘোষণায় তিনি নিজেকে 'প্রভিশনাল হেড অব দ্যা স্টেট' অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা দেন। পরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বসে ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মেজর জিয়ার এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর অনেকেই শুনেছে। সেদিনের ওই ঘোষণাটি হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে দারুণ সাহসের সঞ্চার করেছিল। তার অন্যতম কারণ ছিল শেখ মুজিব সম্পর্কে তখন আর কিছুই জানা যাচ্ছিল না। কেউ মনে করছিল শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়েছেন। আবার কেউ মনে করেছিল তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এমনি অবস্থায় জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার করেছিল। তবে কালুরঘাটের ওই বেতার কেন্দ্রটি আমাদের সৈনিকরা বেশি দিন দখলে রাখতে পারেনি। ৩০ মার্চ রাতের বেলায় পাক বাহিনী বাঙালি সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে বেতার কেন্দ্রটি আবার তাদের দখলে নিয়ে নেয়। একথা স্বীকার করেছেন বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকেই। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত করেছিলেন এবং সামরিক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। পরে জেডফোর্স গঠন করে তাঁর নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরোত্তম খেতাবে ভূষিত করে।

সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার নিরিখে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার মান ছিল অত্যন্ত উঁচু। সেই সেনাবাহিনীর অফিসার হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার ঝুঁকি নেওয়া কম কথা নয়। এর একটা ভয়াবহ দিকও ছিল। বিদ্রোহ যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত তাহলে যাঁরা সেনাবাহিনীতে ছিলেন, মিলিটারি বিচার অনুযায়ী তাঁদের ভাগ্যে কী জুটতো? যাঁরা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন এবং যাঁদের নাম বিপ্লবের শুরুতেই জানাজানি হয়ে যায় তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে যেতে হতো। আর সেখানে যাওয়া মানেই মৃত্যু। বিদ্রোহ যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো এবং সে সময় যদি পাকিস্তানি শাসক টিকে যেত তাহলে জিয়াউর রহমানের সামনে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।